gy³ hy‡×i c¶-wec¶ Ges hy‡×vciva weZK

Aa¨vcK Avey mvgxnv wmivRj Bmjvg

স্বাধীনতার ৩১ বছরের পরে এ বিষয়ে লেখা কেমন যেন লাগছে নিজের কাছেই। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও প্রায়ই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্নজন লিখে যাচ্ছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে তা থামবে বলেও মনে হয়না। আর সে জন্যই আমার এ লিখা। আমি লিখছি এ জন্য যে আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা উপরোক্ত বিষয়ে কি ভাবে তা ব্যক্ত করতে। এটা অবশ্যই ঠিক যে "আমাদের প্রজন্মের সবাই আমার মত করে ভাবে" এমন কথা বলা কোন ভাবেই শোভনীয় হতে পারেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমি আমাকে ৭০ এর প্রজন্ম হিসেবে পেশ করছি কেননা আমার জন্ম হয়েছে '৬৯-এর একেবারে শেষের দিকে।

একটা জাতির উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছার জন্য ৩১ বছর হয়তো (কারো কারো মতে) খুবই স্বল্প সময়। কিন্তু ইতিহাসে এমন নজীরতো আছে যে এর চেয়েও কম সময়ে অনেক জাতি সম্পুর্ণ বিধ্বস্থ অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মোটামুটি মর্যাদাবান একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী ও জাপান এক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। বাংলাদেশ জাতি হিসেবে বিগত তিন দশকে কি অর্জন করেছে তা তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন যাঁরা তিন দশক আগের বাংলাদেশের অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁরা বলবেন যে কিছুটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে অনেকাংশেই আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি যাওবা হয়েছে তাও আবার অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আনুপাতিকহারে অনেক কম। আর উন্নত দেশগুলোর সাথে তিন দশক আগে আমাদের যে তুলনামুলক অবস্থান ছিল তার চেয়ে অনেকগুন নীচে নেমে এসেছে আমাদের বর্তমান অবস্থান।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিছু সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমাদের সমাজব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের রাজনৈতিক মেরুকরণ। আমার ছোটবেলায় এবং বয়ঃসন্ধিকালের প্রারম্ভে যতটুকু সামাজিক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হতো বিগত দশকের শুরুতে বা তার কিছু আগে থেকে সে অবস্থার মারাত্মক ধরনের অবনতি ঘটেছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সাধারন মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিরাজিত ছিল বর্তমানে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তা বহুলাংশেই অনুপস্থিত। গ্রামের বা মহল্লার সমস্যাগুলোকে আগে মুরুব্বীরা সমাধান করতে পারতেন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে অথবা তাঁদের সামাজিক কর্তৃত্বকে কাজে লাগিয়ে। বর্তমানে এ অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। রাজনীতিকিকরনের সীমা এমনভাবে বর্ধিত হয়েছে যে সামান্য আন্তঃ- পারিবারিক কলহকেও আজ আন্তঃর্দলীয় রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ডাকাতি, অপহরন, ধর্ষণ, ও খুন-গুম এগুলো এখন আমাদের নিত্যদিনের সাথী। অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও অন্যান্য সমস্যার কথা না হয় এখানে অনুল্লেখই থাকল। এসবের সমাধানের জন্য যে জাতীয় ঐক্যমত্য দরকার ছিল তা আমাদের সমাজে একেবারেই অনুপস্থিত।

একটা জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, মাথা উঁচু করে তাঁকে দাঁড়িয়ে রাখবার জন্য, আত্মমর্যাদার সাথে বিশ্বের জাতিসমুহের দরবারে নিজের আসন করে নেয়ার জন্য অনেক কাজ করার রয়েছে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় গুরুত্বপুর্ণ; তা হলো কিছু গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্য । এটা সত্য যে জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ সব বিষয়ে একটা জাতির সকল পথ ও মতের অনুসারী জনগণ ঐক্যবন্ধ হতে পারেনা। কিন্তু জাতীয় অস্তিত্ব, এর মর্যাদা এবং সাংবিধানিক ভাবে জাতির পরিচালনা সংক্রান্ত্র ব্যাপারে ঐক্যমত্য থাকা অবশ্যই জরুরী। বাংলাদেশের সমস্যা হলো এখানকার নাগরিকরা শুধু রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই শতধাবিভক্ত নয় বরং জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নেও মারাত্মকভাবে বিভক্ত। এ বিভক্তিতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণীর কুপমণ্ডুক সংস্কৃতিসেবী এবং অশুভ বিদেশী ব্যক্তি। এক একবার মনে হয় এ বিভক্তির কি শেষ হবে? জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তা নিয়ে আমরা কি টিকে থাকতে পারবো? এ দু'টো প্রশ্নের উত্তরই হবে নাবোধক যদি আমাদের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং সংস্কৃতি কর্মীরা আমাদের সমস্যার উৎস খুঁজে বের করে তার যথাযথ সমাধান করার চেষ্টা না করেন। এ সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা হতে হবে রাজনৈতিক আদর্শ বিবর্জিত, নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক। আমার আজকের লেখা মুলতঃ এ প্রচেষ্টার একটা দিক নির্দেশনার ইঙ্গিতবহ মাত্র।

বাংলাদেশী সমাজের বিভক্তির একটি বড় দিক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি এবং যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক। বিষয়টা এমন যে এ নিয়ে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত ছিল অভিসন্দর্ভ রচনা করার। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া ছিল এমন পর্যায়ের যার মাধ্যমে কারন খুঁজে বের করা সম্ভব হতো কেন আমাদের জাতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। হয়তো বিষয়টা এতই সুস্পষ্ট যে কোন সমাজবিজ্ঞানী এ নিয়ে গবেষণার কোন প্রয়োজনই বোধ করেননি। হয়তো বিষয়টা বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন সময়ে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই গণ্য ছিল যে কারনে এ নিয়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ দেশে কোন কথায়ই হয়নি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে হঠাৎ করেই বিষয়টাকে চাঙা করে তোলা হয়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ মদদে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে এতে আরো বেশী করে তেল-ঘি ঢালা হয়েছে। আর তখন থেকে অদ্যাবধি এ বিতর্ক চলেই আসছে। এ বিতর্ক কেউ কেউ আন্তরিকভাবেই করেন তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান ও আপেক্ষিক দেশপ্রেমের কারনে, কেউ কেউ করেন রাজনৈতিক ময়দানকে ধোঁয়াটে করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে; এবং আরো কেউ কেউ আছেন যারা এ বিতর্কের ধারা জিইয়ে রাখতে ইন্ধন যোগান জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার হীন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে।

এ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সংক্রান্ত বিতর্কের নতুন দিক পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। আমার বিশ্বাস এ দিকটা নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের তথা-কথিত স্বপক্ষ শক্তি অথবা তাঁরা যাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বলে থাকেন তাঁরা, কেউই খুব বেশী কথা বলেননি। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ হওয়ার দাবীদার তাঁরাতো এর পুরো ক্রেডিট গ্রহন করতে চান এবং তাঁদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নৈতিক-অনৈতিক সব অস্ত্রই ব্যবহার করেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত বিপক্ষ শক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে এক খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করেন যে তারা ভয় পাচ্ছিলেন ভারতের সাহায্যে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সঠিক মুক্তি বা স্বাধীনতা আসবেনা। ভাল কথা তাহলে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বিরোধিতা করেছিলেন কেনো?

এ বিষয়গুলো নিয়ে আমি বেশ ভেবেছি। ইতিহাসের দারস্থ হয়ে আমি কোন জবাব পাইনি। আজকাল একশ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বললে মনে হয় ১৯৭১ সালের আগে বাঙ্গালী ছিলনা; বাঙ্গলা বলে কোন দেশ ছিলনা; এ অঞ্চলে কোন মানুষ বাস করতনা; এখানে সভ্যতা ছিলনা; ১৯৭১ সালে হঠাৎ করে একটা যুদ্ধের মাধ্যমে আসমান থেকে নাযিল হয় একটা দেশ যা বাংলাদেশ নামে পরিচিত এবং যেখানে বাঙ্গালী নামে এক জনগোষ্ঠির অভ্যুদয় ঘটে; এবং ১৯৭১ সালের আগে এ অঞ্চলের মানুষের কোন ইতিহাস ছিলনা। সে জন্য প্রচলিত ইতিহাসের বই বা পরিচিত ঐতিহাসিকদের দারস্থ হওয়াকে আমি ভয়ের মনে করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে পাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আমার নিজের পড়া ইতিহাসের পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সম্পর্কে একটা মোটামুটি পর্যালোচনা দাঁড় করিয়েছি। এটা এমন কোন থিওরী (প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব) নয় যে পাঠককে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। আমার নিজস্ব একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস অবশ্যই আছে। তাই এ পর্যালোচনা একেবারেই বস্তুনিষ্ঠ হবে এমন দাবীও আমি করবোনা। আমি শুধু পাঠকদের অনুরোধ করবো পুর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধারনা ত্যাগ করে খোলা মন নিয়ে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা আসলে একটা বিষয় আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৯৭১ সালের আগে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় মুসলমানরা ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে 'পাকিস্তান' নামক তাদের জাতীয় একটি আবাসভুমি প্রতিষ্ঠা করে। আমি এখানে "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সঠিক ছিল কি ভুল অথবা কয়টি পাকিস্তান হওয়ার কথা ছিল" এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছিনা। বাঙ্গালী মুসলমানরাও এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুরোভাগে থেকে আন্দোলন করে। আর যে রাজনৈতিক সংগঠন এ আন্দোলন পরিচালনা করে তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায় ১৯০৬ সালে। এটা সত্য যে, যে আশা আকাংখা নিয়ে জনগণ রাষ্ট্রটির পত্তন ঘটিয়েছিল এর কর্ণধারগন সে আশা-আকাংখা মিটাতে পারেননি। অন্যদিকে এ রাস্ট্রের পুর্বাঞ্চলের মানুষ দৃশ্যতঃ বুঝতে থাকে যে তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে শাশকগোষ্ঠির ব্যাপারে ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। অন্যদিকে তরুন একশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় চাচ্ছিল ভিন্ন একটা কিছু, যাদের অধিকাংশই স্বপ্ন দেখছিল একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের। আর এর চেয়ে ভিন্ন একটা গোষ্ঠি ছিল যারা ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেনি এবং যারা প্রথম সুযোগেই চাচ্ছিল ১৯৪৭ পুর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এদেশের মানুষের আশা আকাংখাকে পদদলিত করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে সর্বাত্মক দমন অভিযানে নামলে এদেশের মানুষ আত্মরক্ষার্থে মুক্তিযুদ্ধে নামে। আমার যতটুকু

পড়াশোনা এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধান তাতে আমি বুঝতে পেরেছি যে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সৈনিকরাই প্রথম শুরু করেছিল মুক্তির এই যুদ্ধ নিতান্তই আত্মরক্ষার্থে যেখান থেকে পেছন ফিরে যাওয়ার আর কোন উপায় তাদের ছিলনা। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এর পরিচালনাভার গ্রহন করে। একদল রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক কর্মী ও প্রভাবশালী বাঙ্গালী ব্যক্তিত্ব এই যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেন। আমার আলোচ্য পর্যালোচনায় আমি দেখাতে চেষ্টা করবো তারা কি কোন অপরাধ করেছিলেন কিনা।

আমরা জানি পাকিস্তান একটা দেশ ছিল। এই বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষই সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক সময় আন্দোলন করেছে। এখন এদেশের একদল মানুষ বলছে, "না আর নয়। আমরা তাদের সাথে থাকতে পারিনা যারা শাশনের নামে শোষণের স্টীমরোলার চালায় আমাদের উপর। সময় এসেছে একটি নতুন স্বনির্ভর স্বাধীন রাস্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে আমাদের উপর।" আর একদল (যদিও ক্ষুদ্র) বলল, "না এটা আমাদেরই দেশ; আমাদের পুর্বপুরুষেরা অনেক রক্ত দিয়ে হাসিল করেছেন এ পবিত্র ভুমি। আমরা একে ভাংতে দিতে পারিনা। প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও এর ঐক্য অটুট রাখতে হবে। এ স্বপ্নভুমিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। দেশ থাকলে অন্যায়, অবিচার আর কুশাশনের বিচার একদিন করা যাবে।"

একদলের কাছে যা অধিকার আদায়ের এক পবিত্র সংগ্রাম অন্যদলের কাছে তাই হচ্ছে এক শয়তানী ষড়যন্ত্র; একদলের কাছে যা মাতৃভুমির শৃংখলমুক্ত করনের এক মহান বিপ্লব, অন্যদলের কাছে তাই হলো মাতৃভুমির মর্যাদাহানির এক ভয়ংকর বিদ্রোহ; একদল যাকে মনে করে স্বাধিকার আদায়ের এক অভুতপুর্ব আন্দোলন, আরেকদলের কাছে তাই হলো স্বাধীনতা খর্বকারী এক মরণযাত্রা। একদল যাকে মনে করেছে মুক্তির আনন্দ মিছিল, অন্যদল তাকেই মনে করেছে পরাধীনতার জিঞ্জির পরার নতুন শোক মিছিল। স্বাভাবিক ভাবেই একদল যেখানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহন করেছে অন্যদল সেখানে শুধু অংশগ্রহন করা থেকে বিরতই থাকেনি বরং প্রথমোক্ত দলের জন্য বাধারও সৃষ্টি করেছে। এখন কথা হচ্ছে এ দুটো দলের কেউ কি নিজস্ব অবস্থানের কারনে কোন অপরাধ করেছে? যদি প্রথমোক্ত দলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে দেখা হয় তাহলে দ্বীতিয় দল অপরাধী এবং দালাল। আর যদি দ্বীতিয় দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয় তাহলে প্রথম দল বিদ্রোহী। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে আমরা কি দুটো দলের কাউকে অপরাধী বলতে পারি? প্রকৃত ব্যাপার হলো প্রথম দল তাদের চেষ্টায় সফল হয়েছে। সুতরাং পরাজিত শক্তিকে অসুরে পরিণত করার প্রচারণা তারা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হার- জিতের সাথে সাথেই কিন্তু প্রথম দল একাজ করেনি; বরং তখনই তারা এটা করতে শুরু করেছে যখন তারা দেখতে পায় যে এদেশের জনগণ তাদেরকে শাশক হিসেবে ব্যর্থতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রথম দলের বিবেকবান এবং আন্তরিকতাপুর্ণ মানসিকতার অধিকারী সদস্যরা এখনও তা করেননা।

দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই কোথাও কোন যুদ্ধ হলে সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ থাকেই। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। পক্ষে থাকলেই কেউ ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যাননা এবং বিপক্ষে থাকলেই কেউ অসুর হয়ে যাননা। আর ১৯৭১ সালের অবস্থাটাতো আমরা আলোচনা করলামই। পাকিস্তান একটা প্রতিষ্ঠিত দেশ ছিলো যার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীরাই অনেক ত্যাগ ও কুরবানী করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই যখন এ দেশের ভিতর থেকেই স্বাধীন আরেকটা দেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলো তখন এই বাঙ্গালীদেরই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এর বিরোধীতা করল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে বা তাদেরকে অস্বাভাবিকভাবে দেখারও কি আছে? কোন যুদ্ধে কোন পক্ষ-বিপক্ষে থাকলেই কেউ অপরাধী হয়ে যায়না যদিনা সেটা কোন স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ হয়ে থাকে। এই আমেরিকায়, যেখানে বসে আমি এখন লিখছি, দু-দুটো যুদ্ধ হয়েছে স্বাধীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার। প্রথম যুদ্ধ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা করেছে তাদেরই পিতৃপুরুষের দেশ বৃটেনের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক আমেরিকান বৃটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতাকামী আমেরিকানরা নিজেদেরকে বলত দেশপ্রেমিক (patriot) এবং অন্যদের বলত অনুগত (loyalist)। যুদ্ধ শেষে তারা অনুগতদেরকে অনাগরিক বানিয়ে দেয়নি বা তাদেরকে অহেতুক যুদ্ধাপরাধীও বলেনি। অন্যদিকে ১৮৬১ সালে যখন দক্ষিণের অঙ্গারাজ্যগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যে যুদ্ধ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। স্বাধীনতাকামী দক্ষিণের অঙ্গারাজ্যগুলো (Confederacy) এ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত হয়; যদি কনফেডারেসী জিতত তবে এটা হত তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ/মুক্তিযুদ্ধ। এ সমস্ত যুদ্ধের শেষে তারা পরস্পরকে দোষারোপ করেনি। ইতিহাসে জেনারেল ইউলিসিস গ্রান্টের (পরবর্তীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট) একটা মন্তব্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে

আছে যা তিনি করেছিলেন যখন কনফেডারেসীর কমান্ডার-জেনারেল লী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বিদ্রোহীরা আবারও আমাদের স্বদেশী ভাই (The rebels are our countrymen again)|0

আমার উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা আবার ভাবার অবকাশ নেই যে আমি বোধহয় যুদ্ধাপরাধীদেরকেও নিরপরাধ বলতে চাচ্ছি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি একটি যুদ্ধে - যার মধ্যে বিভক্তির দু'টো দিক রয়েছে এবং দু'টো দিকের দাবীই আপাতঃ দৃষ্টিতে ন্যায্য - কোন একটা বিশেষ পক্ষে থাকলেই কেউ যুদ্ধাপরাধী হয়ে যায়না। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু মানুষ নিশ্চয়ই যুদ্ধাপরাধ করেছে, যাদের বিচার হওয়া মানবতার দাবী। এজন্য এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতে হাজির করতে হবে। অবশ্য এজন্য আমাদেরকে আগে জানতে হবে যুদ্ধাপরাধ বলতে কি বুঝায় এবং যুদ্ধাপরাধী কাদেরকে বলা হয়ে থাকে। এ জন্য আমাদেরকে আন্তর্জাতিক আইনের দারস্থ হতে হবে।

যুদ্ধপরাধ সংক্রান্ত যে বিষয়টা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে তা হলো যারা আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত 'জেনেভা কনভেনশনের' নীতিমালা লংঘন করবে তারাই যুদ্ধাপরাধী। যে কয়েকটা বিষয়কে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে দেখা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেসামরিক লোকজন হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, যুদ্ধবন্দী হত্যা, ইত্যাদি। সুতরাং কাউকে যুদ্ধাপরাধী বলতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধগুলোর কোন একটি করেছে যুদ্ধাবস্থায়। এটা অনস্বীকার্য যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এটা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী গোষ্ঠিগুলোর সব পক্ষ থেকেই হয়েছে। এই অপরাধ যেমন করেছে পাক দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা, তেমনিভাবে করেছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ। অনেকের কাছে বিষয়টা নতুন মনে হতে পারে এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। কারন ১৯৭১ সাল থেকে আজ অবধি কেউ একথাটি বলেননি। যুদ্ধে বিজয়ীরা চিরকালই বিজিতদেরকে হেয় করে দেখানোর চেষ্টা করেছে তাদের লেখনী এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে। পাকবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা যেমন হত্যা, গুম, ধর্ষণ ও বেসামরিক জনগণের সম্পত্তি লুন্ঠনের কাজ করেছে একইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদেরও একাংশ এ সমস্ত অপরাধ করেছে ঐ সমস্ত বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে যারা পক্ষগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এবং ভারতীয় মুহাজির মুসলমানদের (বিহারী) বিরুদ্ধে যারা তাদের স্বপ্নভুমি পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হওয়াকে মোটেই মেনে নিতে পারছিলনা।

এখন এ অবস্থায় আমাদের করনীয় কি হবে? আমরা কি চিরকালই এই বিতর্কে লিপ্ত থেকে যাব? এর কি কোন শেষ হবেনা? জাতি হিসেবে আমরা কি কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবোনা? আমরা কি আমাদের স্বাধীনতাটাকেই অহেতুক বিতর্কের বিষয় হিসেবে জিইয়ে রাখবো নাকি এই স্বাধীনতাকে বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নেবো? যদি আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বে আস্থাবান হই তাহলে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকেই বা বিতর্কের বিষয় হিসেবে জিইয়ে রাখবো কেন?

আমাদেরকে এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। এবং এটা করতে হবে একটা আসু বিষয় হিসেবে। ময়দান অনেক ধোঁয়াটে করা হয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক শিকারীরা তাদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় শিকার ধরার চেষ্টায় রয়েছে আত্মনিমগ্ন, আর আমাদের সার্বভৌমত্বের দুশমনরা রয়েছে ওঁৎপেতে এ স্বাধীনতাকে গিলে খাওয়ার অপেক্ষায়। আর এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে হলে ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধসমুহের বিচার হওয়া অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ তদন্ত। অবশ্য এ কাজ করার সিংহভাগ দায়িত্ব ছিল যুদ্ধ পরবর্তী যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তাদের। আমার যতটুকু জানা তদন্ত কিছুটা শুরু হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারনে সে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল তৎকালীন সরকার, হয়তো থলের বিড়াল বেরিয়ে পরবে এ ভয়ে। আমার বিশ্বাস কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশ ছিল এ ব্যাপারে। এ স্বার্থান্বেষী মহলই এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করায় ব্যস্ত। যথার্থ তদন্ত না হওয়ার কারনেই আমাদের সমাজে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনী (myth) তৈরী হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের সাথে আজ এ ব্যক্তিকে, কাল ঐ ব্যক্তিকে, পরশু অমুক দলকে, তরশু তমুক দলকে জড়ানো হচ্ছে যথার্থ প্রামাণ্য দলীল ব্যতিরেকে। আমার বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেই আপনাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, যতই আপনি মুক্তিযোদ্ধা হননা কেন, এমনকি যদি মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরের কমান্ডারও থেকে থাকেন। যথার্থ তদন্তের ফলাভাবের কারনে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্তও এমন সব কল্পকাহিনী প্রচলিত হয়ে গেছে যা যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্য এবং যে কারনে আমাদেরকে বিশ্বের আর জাতিসমুহের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হচ্ছে।

দেশে একটি সুস্থ রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টির স্বার্থেই - যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি - মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত সব অপরাধের তদন্ত হওয়া উচিত তা যারাই করুকনা কেন। যে কোন বেসামরিক লোকজনের

বিরুদ্ধে কৃত অপরাধই যুদ্ধাপরাধ তারা যুদ্ধে যে পক্ষই অবলম্বন করেননা কেন। সুষ্ঠু তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা যখন বেরিয়ে আসবে তখন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা সেগুলোকে আর ময়দান ঘোলা করার কাজে ব্যবহার করতে পারবেনা। সৎ ও চরিত্রবান রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের চরিত্রহননের কাজে এগুলোকে আর ব্যবহার করতে পারবেনা। কাল্পনিক কিস্‌সা-কাহিনী দিয়ে জনমনকে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। জনগণ তখন সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে চিনতে পারবে এবং কারো অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেনা। আর এভাবেই তারা জানতে পারবে কারা আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির কান্ডারী হতে পারবে। এ ব্যাপারটা খুব সহজ হবে এমনও আমি বলছিনা। যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে ব্যক্তিগত ও দলীয় ফায়দা লুটায় ব্যস্ত এবং যারা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করে আবার আমাদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে বাঁধার চেষ্টায় রত তারা একাজ সহজে করতে দিবেনা। তারা চাইবেনা আমাদের এই জাতি রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে জাতীয় উন্নতি ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হউক। এজন্য আমি আমার প্রজন্মের তরুনদেরকে অথবা আমাদের পরের প্রজন্মের তরুনদেরকে আহ্বান করবো যেন আমরা জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই মুক্তিযুদ্ধ কালীন সংঘটিত সব ধরনের যুদ্ধাপরাধের প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটন করার চেষ্টা করি। আমি আগেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কে কোন পক্ষ নিয়েছেল সেটি কোন মুখ্য বিষয় নয় বরং প্রকৃত বিষয় হতে হবে যুদ্ধাপরাধ কারা করেছিল এই দু'পক্ষের মধ্যে তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদের অপরাধের যথার্থ দলিল তৈরী করা। এটা রাজনৈতিক অপপ্রচারের হাতিয়ার বানানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং হতে হবে প্রকৃত অপরাধের শাস্তি বিধানের নিমিত্তে, নিতান্তই ন্যায়বিচার ও মানবতার মর্যাদার স্বার্থে; কোন রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির প্রতি অযৌক্তিক ঘৃণার বা গোষ্ঠিগত ও জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নয়।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, তা হলো মুক্তিযুদ্ধে কেউ আমাদের পক্ষে থাকলেই যে সে আমাদের স্বাধীনতারও স্বপক্ষে থাকবে এমন কোন কথা হলফ করে বলা যেতে পারেনা। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি এবং আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি এক ও অভিন্ন এমন ধারনা করারও কোন অবকাশ নেই। একথা সর্বজনবিদিত যে ভারত কখনোই আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি নয় অথচ এ ভারত সন্দেহাতীতভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি। একটা যুদ্ধকালীন সময়ে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করা আর যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটা দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে থাকা এক কথা নয়। তাই প্রয়োজন রয়েছে আজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ কারা ছিল তা নয় বরং কারা বর্তমানে আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তা নির্ধারন করা। এটা না করতে পারলে আমাদের সার্বভৌমত্বকে আবারও অবদমিত করা হতে পারে। যারা বাংলাদেশের জাতিসত্তায় বিশ্বাস করে এবং এর সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করে একে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশগ্রহন করে তারা সবাই আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি। আর যারাই মনে করে জাতি হিসেবে টিকে থাকার আমাদের কোন সামর্থ নেই; সার্বভৌমত্বের জন্য আমরা অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল; আমাদের যে বর্তমান সীমানা (border) তার কোন প্রয়োজন নেই, তারা সবাই আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এ জাতীয় চিন্তার আগ্রাসন থেকে আমাদের যুবসমাজকে মুক্ত করতে এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করতে। আর এজন্য আজ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক শৃঙ্খলা উন্নয়নকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে সব মতপার্থক্যের উর্ধ্বে।

[লেখক পরিচিতিঃ আবু সামীহা সিরাজুল ইসলাম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থ অলিম্পিয়া কলেজের গণযোগাযোগ (Mass Communication) বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বর্তমানে নিউইয়র্কে বসবাসরত এবং একটি স্কুলের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক। যোগাযোগ: sathii@msn.com]